আজকের কাগজ

তারিখ 07 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

টিক্ চিহ্নের পরীক্ষা কতোটা যুক্তিযুক্ত

প্রবীর চন্দ

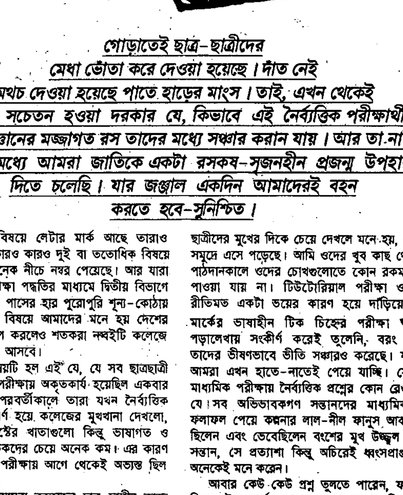

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সব বোর্ডের বেরিয়ে গেল। বলা যায়, পরীক্ষায় শতকরা পাসের হার কারো জন্যেই দুশ্চিন্তার ছিল না। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল-এর পূর্বে যতোবেশি অভিভাবককে অস্বস্তিতে রাখতো এবং ভাবিয়ে তুলতো তা থেকে এখন তারা অনেকটা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। তারা এখন পরীক্ষার ফেইল (Fail) নামক দুঃখজনক শব্দটির সাথে তাদের সন্তানদের ফলাফলকে আর জড়াতে চান না। বরং স্বপ্নভুক হয়ে পড়েছেন। 'ফেইল' থেকে তাদের কল্পলোকের চিন্তাটা এখন ফেঁপে-ফুলে উঁচুটান হয়ে ডিভিশনের ঘরে গিয়ে পৌঁছেছে। ফার্স্ট ডিভিশন থেকে কল্পরেখা সরে গিয়ে স্টার মার্কে গিয়ে পৌঁছেছে। সারাদেশ এখন স্টার-লরিয়েট দ্বারা পরিপূর্ণ। বলা যায়, ধন্য ছেলের অধ্যবসায়! বলা যায়, ধন্য শিক্ষক জ্ঞান দেওয়ায়!

অর্থাৎ পরীক্ষার ফলাফল দেখে মনে হতে পারে যে স্কুলগুলোতে প্রকৃতপক্ষেই লেখাপড়ার মান ও পরিবেশ অদ্ভুত পরিমাণে বেড়ে গেছে। কারণ, পাসের ঘরটা একদম সিঙ্গেল কোঠায় নেমে গিয়ে ডিভিশনের ঘরটা প্রকান্ড আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে ফার্স্ট ডিভিশনের ঘরটা সবচেয়ে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। রেজাল্ট সিট হাতে নিয়ে দেখা যায় যে, বিষয়ভিত্তিক লেটারসূচক মার্কসহ অজস্র তারাবাতি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। শিক্ষা আকাশের খবরাখবর আজ নক্ষত্ররাজীতে পরিপূর্ণ। বলা যায়, এক খন্ড কালো মেঘও আজ আর দেখা যায় না। তবে 'নক্ষত্র' পতন ভবিষ্যতে না হলেই আমাদের সকলের মঙ্গল।

সত্যি ব্যাপারটা যেন তাই। রেজাল্টগুলো যেন একটা হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতো ভালো রেজাল্ট দিয়ে ওরা যে কী করবে, কোথায় যাবে, কোন কলেজে পড়বে তা নিয়ে এখন বড় পারিবারিক দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কেউ কেউ এতোটা ভাবতেই পারেনি যে, আঙুল ফুলে তারা রাতারাতি কলা গাছ হয়ে যাবে। এ যেন এক আশ্চর্য প্রদীপ-আলাদ্বীনের। সত্যি এই পরীক্ষা পদ্ধতির একটা যাদুমন্ত্র আছে: একটা ক্যারিসমা আছে। যার ফলশ্রুতিতে অপড়ুয়া অমেধাবী ছাত্ররাও ভালো ফলাফলের অংশীদার হতে পেরেছে।

তবে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো রেজাল্ট হলে কার না ভালো লাগে, বলুন! বিশেষ করে যে প্রতিষ্ঠানে সব ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীদের কী না স্বর্গসুখ অনুভব করেন। কিন্তু ঐ শিক্ষার্থীরা যদি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সিংহভাগই অকৃতকার্য হয় তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়? কিংবা এর দায়-দায়িত্ব কারা নেবে? এ রকম একটা প্রশ্ন এসে যায় না কি? যুক্তিবিদ্যায় এ রকমই একটা Fallacy আমাদের প্রতি বছরই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে হয় এবং তার বৈধতা যাচাই করতেও বলা হয়। যেমন-মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের হার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাসের হারের চেয়ে অধিক, কাজেই এটা স্পষ্ট যে, স্কুলের শিক্ষাদান কলেজের শিক্ষাদানের চেয়ে উন্নততর।

বস্তুত এরকম Fallacy তে আমরা যারা কলেজে শিক্ষকতা করি তারা আজ সমাজের কাছে ধরা পড়ে গেছি। কারণ, ইতিমধ্যেই সব কলেজেই আভ্যন্তরীণ বার্ষিক পরীক্ষা (Promotion test) শেষ হয়ে গিয়েছে। কোন কোন কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের Promotion দিয়ে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বর্ষে ক্লাসও শুরু করেছে। কিন্তু উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল কি, তা যদি সবাই জানতে পারত তা হলে হয়তো জোঁকের মুখে লবণ পড়তো। তাহলে খবরটা একটু খোলাখুলি বলাই ভালো। অর্থাৎ আমাদের কলেজে এবার প্রমোশন টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে মোট তিনশ' জন ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট একচল্লিশ জন। আর পরিষ্কারভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে সর্বমোট পঁচিশজন। অর্থাৎ ভর্তিকৃত প্রথম বিভাগের শিক্ষার্থীরাও যাদের মধ্যে অনেকেরই অনেক বিষয়ে লেটার মার্ক আছে তারাও অকৃতকার্য হয়েছে। কারও কারও দুই বা ততোধিক বিষয়ে পাস নম্বরের চেয়ে অনেক নীচে নম্বর পেয়েছে। আর যারা গত বছরে চলতি পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের পাসের হার পুরোপুরি শূন্য-কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের মনে হয় দেশের অন্যান্য কলেজে জরিপ করলেও শতকরা নব্বইটি কলেজে একই ফলাফল বেরিয়ে আসবে।

গোড়াতেই ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে। দাঁত নেই অথচ দেওয়া হয়েছে পাতে হাড়ের মাংস। তাই, এখন থেকেই আমাদের সচেতন হওয়া দরকার যে, কিভাবে এই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার ও জ্ঞানের মজ্জাগত রস তাদের মধ্যে সঞ্চার করান যায়। আর তা না হলে, এরই মধ্যে আমরা জাতিকে একটা রসকষ-সৃজনহীন প্রজন্ম উপহার দিতে চলেছি। যার জঞ্জাল একদিন আমাদেরই বহন করতে হবে-সুনিশ্চিত।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টি হল এই যে, যে সব ছাত্রছাত্রী রচনামূলক মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল একবার কিংবা দু'বার এবং পরবর্তীকালে তারা যখন নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়ে কলেজের মুখখানা দেখলো, তাদের প্রমোশন টেস্টের খাতাগুলো কিন্তু ভাষাগত ও বানানের ত্রুটি নৈর্ব্যক্তিকদের চেয়ে অনেক কম। এর কারণ হল, এরা রচনামূলক পরীক্ষায় আগে থেকেই অভ্যস্ত ছিল বলেই এমনটি হয়েছে।

বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর কাছে উত্থাপন করলে তারা সরাসরি মাধ্যমিক পরীক্ষার পদ্ধতিকেই দায়ী করে। objective type প্রশ্নের Affect-এ তারা রুগ্ন। গণিত ছাড়া আর সব বিষয়ই পঞ্চাশ নম্বরের objective type পরীক্ষা তাদের দিতে হয়েছে। যার কোন ভুল্য মার্ক কাটা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয়, কুয়োর ব্যাঙ সমুদ্রে এসে পড়েছে। আমি ওদের খুব কাছ থেকে দেখেছি পাঠদানকালে ওদের চোখগুলোতে কোন রকম দীপ্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। টিউটোরিয়াল পরীক্ষা ওদের কাছে রীতিমত একটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চাশ মার্কের ভাষাহীন টিক চিহ্নের পরীক্ষা শুধু তাদের পড়ালেখায় সংকীর্ণ করেই তুলেনি, বরং শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ভীষণভাবে ভীতি সঞ্চারও করেছে। যার ফলাফল আমরা এখন হাতে-নাতেই পেয়ে যাচ্ছি। যেহেতু, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের কোন রেওয়াজ নেই। যে সব অভিভাবকগণ সন্তানদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে কল্পনার লাল-নীল ফানুস আকাশে উড়িয়ে ছিলেন এবং ভেবেছিলেন বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে তার সন্তান, সে প্রত্যাশা কিন্তু অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে বলে অনেকেই মনে করেন।

আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, ফার্স্ট ডিভিশন কিংবা স্টার মার্ক পাওয়া ছেলে-মেয়েরা কিভাবে ফেইল (Fail) করতে পারে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়? এটা কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়। হয়তো এ কথাও অভিভাবকরা বলতে পারেন, কলেজের পড়াশোনা মোটেও হয় না বলেই তাদের সোনার ছেলেমেয়েরা অনুত্তীর্ণ হয়েছে, এর জন্যে সম্পূর্ণ কলেজ শিক্ষকরাই দায়ী। এ ক্ষেত্রে শুধু বলবো, কথাটি ঠিক নয়। অর্থাৎ সত্য কথা এই যে, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি, মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতির ন্যায় আমূল সংস্কার এ পর্যন্ত সরকার করেনি বলেই দু'টি সিস্টেমের মধ্যে অহি-নকূল সম্পর্ক রয়ে গেছে। যেমন ধরুন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ড কর্তৃক ৫০০টি বাছাইকৃত প্রশ্ন নির্ধারিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বিষয়ে ৫০ মার্ক টিক চিহ্নের সাহায্যে নম্বরপ্রাপ্ত হলে নয়টি বিষয়ে (গণিত ছাড়া) ৪৫০ নম্বর শিক্ষার্থী এমনিতেই পেয়ে যায়। কিন্তু এ রকম প্রশ্ন সংরক্ষিত একটি ব্যাংক ব্যবস্থা না থাকার জন্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল আকাশ-পাতাল তারতম্য ঘটবে এবং এটাই সত্য ও যুক্তিযুক্ত। এর দায়-দায়িত্ব শিক্ষকের নয় বরং পরীক্ষা সিস্টেমটির কিংবা তার আবিষ্কারদের।

এখন বলতে পারেন এই আবিষ্কারক কে? এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়- জেনারেল এরশাদ ও তার শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু এর পরেও ঐ পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরো তরলীকরণ করা হয়েছে। আগে ছিল, রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক অংশে পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, কিন্তু এখন তা আর নেই। দু'টো মিলেই পাস করতে পারলেই পাস। অর্থাৎ এরশাদ চলে গেছে কিন্তু তার এই শিক্ষানীতিকে বর্জন করা সম্ভব হয়নি। বরং একে তেল-সিঁদুর দিয়ে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে রেখেছে বর্তমান সরকার। অথচ অন্যসব ক্ষেত্রে এই সরকার সবকিছু উল্টিয়ে দিয়েছে রাতারাতি। এরশাদের নাম যেখানে আছে সেই স্থানটাই মুছে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পুনঃ মুষিক ভবঃ। আগে যা ছিলে তাই থাকো। তাই, উপজেলাকে মুহূর্তের ঘোষণায় থানাতে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে কেনো জানি পূর্বের 'ইঁদুর' টি আর পাওয়া গেল না।

যাকগে সে কথা। ফিরে আসি আবার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে। গতবারের মতো এবারও অনেক গার্জিয়ান আমার কাছে এসেছিল কিংবা চলতি পথে কথা হয়েছিল যে, তাদের সন্তানদের কোথায় পড়াবে। গতবার আমি ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল দেখে নিজ কলেজেই অধ্যয়ন করতে ভীষণভাবে উৎসাহ দিয়েছিলাম। এই মনে করে যে, কলেজের গুণগতমান বাড়াতে হলে ভাল গুণ ও মেধা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু সেইসব ছাত্র-ছাত্রী প্রায় যখন সব বিষয়েই অকৃতকার্য হয় প্রমোশন টেস্টে তখন এবারের উৎসাহটা আর থাকেনি। ভাবছি, অহেতুক এই আত্মতুষ্টির ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যতের কথাটা। ভাবছি, নকল প্রতিরোধকল্পে সরকার যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নীতি নির্ধারণ করেছে (যার জন্য শিক্ষকরা সারা বাংলাদেশে এতো লাঞ্ছিত হল) তার পাশাপাশি, শূন্য মস্তিষ্কে যারা প্রায় ভাষাহীনভাবে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রবেশ করেছে তাদের কথা। দুটোর মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? নকল তো তারাই করে যাদের মেধাশক্তি খুবই দুর্বল। মেধা যাদের বিদ্যা স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে অপারগ তারাই তো পরীক্ষা হলে কাগজের টুকরো নিয়ে আসে। কিন্তু যে পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল অসাদুপায়কে ঠেকান সেই হয়ে পড়েছে নকলের চাবিকাঠি।

ফলে আমাদের ধারণা এই যে, আগামী বছরগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা সীমাহীনভাবে বেড়ে যাবে। বলা যায়, এই অশনি সংকেত আমরা অনেকাংশে পেয়ে গেছি। কারণ, গোড়াতেই ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে। দাঁত নেই অথচ দেওয়া হয়েছে পাতে হাড়ের মাংস। তাই, এখন থেকেই আমাদের সচেতন হওয়া দরকার যে, কিভাবে এই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার ও জ্ঞানের মজ্জাগত রস তাদের মধ্যে সঞ্চার করান যায়। আর তা না হলে, এরই মধ্যে আমরা জাতিকে একটা রসকষ-সৃজনহীন প্রজন্ম উপহার দিতে চলেছি। যার জঞ্জাল একদিন আমাদেরই বহন করতে হবে-সুনিশ্চিত।

প্রবীর চন্দ: কবি ও কলাম লেখক, কলেজে অধ্যাপনা করেন।